শতবর্ষের আলোকে কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্র

আভাস চন্দ্র মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের যে কয়েকজন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক নিজ লেখনীর দ্বারা সাহিত্য জগতে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য হলেন বিখ্যাত কথাকার বিমল মিত্র। শতবর্ষ পেরিয়ে আজও তিনি বাঙালির মননে সমভাবেই দীপ্যমান। শতবর্ষের আলোকে লেখকের সামান্যতম শ্রদ্ধাঞ্জলী এই নিবন্ধ।

'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' প্রভৃতি বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হওয়াতেই শুধু যে তিনি এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, ইতিহাস কিন্তু সে কথা বলে না। বরং সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্যই তিনি অকাতরে লিখে গেছেন। আবার, বড়দের জন্যই যে শুধু লিখেছেন, তা কিন্তু নয়, ছোটদের আনন্দ দেবার জন্য উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখতেও তিনি কার্পণ্য করেননি। 'নবাবী আমল', 'মৃত্যুহীন প্রাণ' প্রভৃতি কালজয়ী গ্রন্থ।

আমরা সকলেই জানি তাঁর লেখা 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' অসাধারণ ও অনুপম এই উপন্যাসটির জন্য ১৯৬৪ সালে বিমল মিত্র রবীন্দ্র পুরস্কারে ভুষিত হয়েছিলেন। অনন্যসাধারণ এই সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় উপন্যাস। ধারাবাহিক হিসাবে একটি জনপ্রিয় প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসটি। একই সময়ে শংকরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' একই সাথে সেই 'দেশ' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। এ-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শংকরের অনুভূতি হল ঃ বিমল মিত্রের মাথার মধ্যে একটি সুবৃহৎ কমপিউটার যন্ত্র বসানো ছিল। তাঁর উপন্যাস লেখার পদ্ধতিটাই ভিন্ন ধরণের। কোথাও খাতাপত্তর, নোট নেই, কিন্তু আশ্চর্যভাবে লেখক অতি নিপুণতার সঙ্গে এক একটি চরিত্রকে ঘটনার রণক্ষেত্রে নামিয়ে দিচ্ছেন, মনের মধ্যে কোথাও ঠিক করা আছে আবার কোন অধ্যায়ে (Chapter) কী ভাবে তার পুনঃপ্রবেশ ঘটবে। লেখকের সঙ্গী বলতে একটা ক্লীপ ফাইলের মধ্যে গোটা কয়েক ফুলস্কেপ সাইজের লাইন টানা কাগজ। কলমের বাহার ছিল। সোনার পার্কার ফিফটি ওয়ান কলম আর মুক্তোর মতো দৃষ্টিনন্দন হস্তলিপি। কালির রং সবসময় রয়েল ব্লু। কড়ি দিয়ে কিনলাম ও চৌরঙ্গী লেখার আতুরঘর কলকাতার আলীপুরের বিখ্যাত লাইব্রেরী-- ন্যাশনাল(বেলডেভিয়ায়)। এখান থেকে আমরা দুইজন গল্প-উপন্যাসের রসদ পেয়েছি। তখনকার দিনে লাইব্রেরীর কর্মী নকুলবাবুর সাহায্য পেয়েছি। নকুলবাবু উদ্ভট অবিশ্বাস্য ঘটনার তথ্য সরবরাহ করতেন। দুইজনের মধ্যে মাঝেমধ্যে লাইব্রেরীতে দেখা হত, লেখার তাগিদে দুইজনেই যেতাম। দুইজন যখন লিখতে লিখতে একঘেয়েমি-ক্লান্তিবোধ করতাম, তখন উঠে পড়তাম। সেই সময় বিমলবাবুরও একই অবস্থা। আমার চেয়ে বড়ো। একদিন আমার সামনে এসে বললেন মৃদুস্বরে, চলুন, বাইরের রাস্তায়(চাতালে) ঘুরে আসি। সেইমতো আমরা দুজনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে পায়চারি করতাম। লাইব্রেরীর মাধ্যমেই অমাদের দুজনের সখ্যতা গড়ে ওঠে।

প্রখ্যাত গবেষক ও 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর লেখক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ছোটগল্পকারদের নিয়ে আলোচনায় এক জায়গায় বলেছেনঃ কোনো কোনো গল্পকার

সমাজে ও পরিবারের চিরাচরিত মূল্যবোধ নিয়ে, কেউবা নিজের চেতনাকে নিয়েই ছোটগল্পের অভিনব দিগন্ত আবিস্কারের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য নরেন গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র — চিরাচরিত ধারার গল্প যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং অতি তরুণ সম্প্রদায়ের বিচিত্র পরীক্ষা এখনও শিক্ষিত ও রসিক মহলে যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। যাই হোক, তখনকার গল্পকাররা সারাভরতেই বিষ্ময় সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্য মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

অনেকের অভিমত, তিনি ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাস লিখে পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন। রমাপদ চৌধুরী, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, শক্তিপদ রাজগুরু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর সমগোত্রীয় লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর লেখায় সাসপেন্স থাকতো। তাঁর লেখা শেষ পর্যন্ত না পড়ে, গল্পের পরিণতি না জেনে পাঠক নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন না। তাঁর নোতুন বই প্রকাশ হলেই পাঠকদের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যেত এবং লাইব্রেরীতে বই সংগ্রহ করার জন্য লাইন পড়ত— ছোটবেলায় এ দৃশ্য আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করেছি।

বিমল মিত্র তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠককে মোহাবিষ্ট করে রাখতেন। নেশাগ্রস্ত মানুষের যেমন ঘোর কাটে না, তাঁর লেখা পড়ে পাঠকের মধ্যেও একই ভাবের উদয় হত। তাঁর মতে, এটাই লেখকের খেলা— অর্থাৎ গল্পকারের নিজস্ব মুন্সিয়ানা। তিনি আরও বলতেন, পাঠককে অ্যানাস-থেসিয়ায় ফেলতে না পারলে নিজের প্রয়োজনমত গল্পটার বেগ নির্ধারণ করবো কেমন করে? প্রায় একই কথা বলতেন আর এক সাহিত্যের জাদুকর— রহস্য-গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্পের মধ্যেও এই ছোঁয়া পাওয়া গেছে।

প্রখ্যাত লেখক বিমল মিত্রের লেখার আঙ্গিক এবং পরিবেশন-কৌশল সম্পর্কে আলোচনায় জনৈক সমালোচক বলেন ঃ লেখকের নিজস্বতা বা সেক্রেট (গোপনীয়তা) উদ্ধার করার পদ্ধতি, যা লিখিতভাবে কোথাও পাওয়া যায় না, সে সম্বন্ধে বিমল মিত্রের বিচিত্র ভাবনাগুলো লিপিবদ্দ করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিকদের জন্য। আমি মনে করি, প্রত্যেক সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে কিছু রহস্যময় গোপনীয়তা সযত্নে লুকানো থাকে এবং তা উদ্ধারের একমাত্র উপায় রচনাটিকে একাধিকবার পাঠ করা। যাঁরা কেবল পাঠ করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান, তাঁদের এই কষ্টের মধ্যে পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁরা রহস্যভেদ করে নিজের সৃষ্টির পথকেও অতুলনীয় করতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের সাহিত্য-পাঠ পদ্ধতি সাধারণতঃ অন্যরকম। রসিক বিমল মিত্র প্রয়োজনে উত্তর কলকাতার মিষ্টান্ন নির্মাতাদের শরণাপন্ন হতেন। নোকুলের সন্দেশ খাওয়া নিয়ে সমালোচক আরও বলেন, অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনতাম। বিমল মিত্র বলেছেন, সন্দেশ শ্রেষ্ঠ মিষ্টি। এই শ্রেষ্ঠ মিষ্টি ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। লেখক ও মোদক দুই রসের স্রষ্টাই আনন্দের অমৃত সন্ধানে বেরিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ বাংলা সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী কোনোটাই কড়া চড়িয়ে ভিড় জমাতে আগ্রহী নয়, কারণ বাংলার সৌন্দর্যবোধের কথাটাই হল পরিমিতিবোধ।।

বিমল মিত্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে রেখাপাত না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

বলে মনে হয়। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্রের জন্ম ৩-রা মার্চ ১৯১২, মৃত্যু ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১। পড়াশুনা দক্ষিন কলকাতার চেতলা স্কুলে, প্রাথমিক ও ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সফলতার সঙ্গে বি.এ এবং পরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য বাধ্য হয়ে বাবার পীড়াপীড়িতে দক্ষিনপূর্ব রেলওয়েতে যোগ দেন। চাকুরীর সাথে সাথেই চলে সাহিত্যচর্চা। অর্থাৎ লুকিয়ে গল্প ইত্যাদি লেখা এবং লাইব্রেরীতে যাওয়া। শোনা যায়, একবার বই পড়তে পড়তে তিনি লাইব্রেরীতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং সবাই চলে যাওয়ার পর দরজা জানালা বন্ধ করতে এসে কেয়ারটেকারের নজরে পড়েন এবং অত রাতে বাড়ি ফিরতে না পারার জন্য লাইব্রেরীর বাইরেই তাঁকে রাত কাটাতে হয়।

আগেই বলেছি শংকর অর্থাৎ মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের সাথে বিমল মিত্রের সখ্যতা ও যথেষ্ট ঘনিষ্টতা ছিল। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় যে, বিমল মিত্র একবার বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) প্রবাসী হয়েছিলেন সাময়িকভাবে। নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাঁকে। শংকর লিখছেনঃ আমার বিবাহ সম্পর্কে মতামত পাল্টে ফেলে চিঠি লিখে জানালেন, 'সৃষ্টির কঠিনতম পর্ব মানসিক ও দৈহিক একাকিত্ব লেখার বিশেষ ক্ষতি করতে পারে।' দৈহিক একাকিত্ব শব্দটির এমন তুলনাহীন ব্যবহার তাঁর মতো দক্ষ শব্দশিল্পীর পক্ষেই মানায়। যদিও বলতেন, গল্প, গল্প, গল্পই সব। ভাষা অলংকার আর সবই গল্পের দাসদাসী।

প্রকৃতপক্ষে, স্বনামধন্য এই কথাসাহিত্যিক তুলনাহীন গল্পকার হিসেবে বাঙালি পাঠকের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন একথা অনস্বীকার্য।